নাটকে পল্টুদার মহা উৎসাহ। কথাশিল্পের আর-এক নিয়মিত আড্ডাধারী সুব্রত নন্দীর 'ভালোমানুষ' প্রযোজনার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতেন। আর বাদল সরকারকে নিয়ে তাঁর উৎসাহ তো একটা সময়ে প্রায় অব্‌সেশনে পরিণত হয়েছিল। প্রায়ই যেতেন বাদল সরকারের কাছে। এসে নানান গল্প করতেন। গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল গৌরীদার (অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ) সঙ্গে। পল্টুদার করা অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা-র অনুবাদ পড়ে গৌরীদা তার সাহিত্যগুণে বিমোহিত হয়ে সেটি প্রকাশ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। দুই শেক্‌স্পীয়ার-বিশারদের সেইসব রোমাঞ্চকর টেট-আ-টেট-এ কখনো কখনো সাক্ষী থাকতাম। যখন তখন তাঁকে উত্ত্যক্ত করেছি সঠিক শব্দের সন্ধানে। কখনো বিফলমনোরথ হয়েছি মনে পড়ে না।

আমি তাঁকে অনুবাদ-সার্বভৌম বলতাম। অখুশি হতেন না। স্নেহ করতেন খুব। বাড়িতে ফোন এলে এঁটো হাতে তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করেছি, মনে পড়ে। মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণ-অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধানো ছবির নীচে মালা রাখবার সময় মনে হল যেন একবার চোখ টিপে হেসে দিলেন। মনের ভুল নিশ্চয়ই।

আর আসতেন রণেনদা, ঋত্বিক ঘটকের ছবি-খ্যাত রণেন রায়চৌধুরী। ভাবে-ভোলা কথাটা বইতে পড়েছি, সেই প্রথম একজন ভাবে-ভোলা মানুষ দেখলাম। এলোমেলো চুল, কাঁচা-পাকা দাড়ি, খাদির পাঞ্জাবি আর ধুতি, কাঁধে ঝোলা, পানে-কালো ঈষৎ-উঁচু দাঁত, সর্বদাই অমল হাসিতে বিস্ফারিত আস্য— এই ছিলেন রণেনদা। অসম্ভব তোতলা ছিলেন, একটানা বিনা-ব্যাঘাতে কথা প্রায় বলতেই পারতেন না। কিন্তু গান ধরলেই অন্য মানুষ। কালীদার (দাশগুপ্ত) সঙ্গে তাঁর গভীর প্রেম। একদিন কী প্রসঙ্গে যেন 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' গানের কথা উঠল। বললাম, হেমাঙ্গদার কাছে শুনেছি, শচীন দেবের সুরটা 'সিন্থেটিক', অরিজিন্যাল নয়। রণেনদা মাথাটাথা দুলিয়ে বললেন, 'শ্‌শ্‌শোনবেন অরিজিন্যাল সুরখানা?' — বলেই বিনা ভূমিকায় চোখ দুখানা বুজে, ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক করে, নমস্কারের ভঙ্গিতে কনুই ভেঙে দু-হাত থুতনির কাছে এনে এক হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলে জড়িয়ে, একটা নির্দিষ্ট লয়ে দুলতে দুলতে অচেনা সিলেটি উচ্চারণে ধরলেন: নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভইম্‌রা। অন্য সুর, অন্য মেজাজ। 'পোদ্দু যেমোন ভাসে গুঙ্গার জলে রে ভইম্‌রা-আ' অংশটি গাইবার সময় তাঁর মুখে, তাঁর দেহে অদ্ভুত একটা ভাষা ফুটে উঠত, স্পষ্ট বোঝা যেত তিনি এ জগতে নেই। এগুলোকে নাকি মারিফতি গান বলে। আর সেই নমাজ আদায় না-হওয়ার গান যে কত বার শুনেছি, তার হিসেব নেই। সে-গান আবার গাইতেন অন্যরকম ভঙ্গিতে, যদিও

একইরকম মগ্নতা নিয়ে। বলতেন, যে-গান যে-মানুষের কাছে শেখা, সেই মানুষটির ভাবভঙ্গি হুবহু আনতে না পারলে তাঁর গলা দিয়ে আসল সুরটি বেরোয় না। সেই মূল শিল্পী যেন ভর করতেন তাঁর দেহে। গান শেষ হয়ে গেলেই আবার অন্য মানুষ, অন্য অর্থে মাটির মানুষ।

একদিন মনে আছে, আধা-সামন্ততন্ত্র নাকি সিকি-সামন্ততন্ত্র আর মুৎসুদ্দি-পুঁজিতন্ত্র নিয়ে আমাদের তুলকালাম কাণ্ড চলেছে কথাশিল্পের গর্ভগৃহে, এমন সময় রণেনদার আবির্ভাব। একেবারে রাস্তা থেকে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে ঢুকলেন: আমার কালো পাখি গেল উড়ে ভালোবাসার শিকল ছিঁড়ে। কেউ একজন তড়িঘড়ি একটা বসবার জায়গা ছেড়ে দিল। রণেনদা অনির্দেশ নয়নে জল ভরে টানা গেয়ে চললেন। পুরো গানটা গাইলেন। উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটা কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেলেন। মিনিটখানেক পর ঘোর ভেঙে মন্টুদা বললেন: 'বুঝলি তো, ওর আসলে কিছু একটা বলার ছিল, সেইটা গানে বলে দিয়ে চলে গেল।'

আর-এক দিনের কথা। কালীদা প্রস্তাব দিলেন, চলো, একটু কফি খেয়ে আসি। কফি হাউসের দোতলায় গিয়ে বসলাম আমি, রণেনদা আর কালীদা। হালকা ঢঙে একথা সেকথা হচ্ছে। অনিবার্যতই ঋত্বিকের কথা উঠল। রণেনদা দেখলাম বেশ বিহ্বল, ক্লিষ্টই বলা যায়। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললাম, 'রণেনদা, আপনি কখনো রবীন্দ্রনাথের গান করেননি?' 'নাঃ, ঐটার তো উচ্চারণ, ঢংঢাং অন্যরকম, বোঝলেন না, ও আমার আসে না।' বললাম, 'কেন, বাউল অঙ্গের কিছু গান তো গাইলে পারেন।' এতক্ষণের ঢিলেঢালা মানুষটা হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। 'শ্‌শ্‌শোনবেন?'— বলেই কী শোনাবেন তার বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে বেশ উঁচু স্কেলে আচমকা ধরলেন, আমার নাইবা হল পারে যাওয়া। যে-হাওয়াতে চলত তরী, অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া। প্রতিবেশী টেবিলগুলো নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত, যেন ফ্রীজ শটে বন্দী। একতলার ভৈরবকল্লোল ভেদ করে ছড়িয়ে যাচ্ছে রণেনদার দানাদার রবীন্দ্রনাথ: কম কিছু মোর থাকে হেথা/পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।/আমার সেইখানেতেই কল্পলতা/যেখানে মোর দাবি-দাওয়া। কালীদা স্থির। আমি প্রস্তরীভূত। একটু পরে কফির দাম চুকিয়ে কেউ কোনো কথা না বলে যার যার পথে চলে গেলাম। ঐ অবস্থায় কথা বলা যায় না। বললে সেটা ব্লাসফেমি হয়ে যায়।

কালীদা আর মন্টুদার ছিল তুই-তোকারির সম্পর্ক। সুরাসারাৎসার নিয়ে কালীদার গভীর ব্যুৎপত্তি রসিকদের চমৎকৃত করত। মুগ্ধ হতাম তাঁর বিচিত্র জীবনের অজস্র গল্প